অবসাদ-উদ্বেগ-অনিদ্রা মুক্তির উপায়

AUTHOR

ডাঃ অলোক পাত্র

স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ

M.B.B.S. (Cal), D.P.M. (NIMHANS, Bangalore)
D.N.B. (Diploma of National Board, New Delhi)
F.I.P.S., F.I.A.S.P., M.I.M.A:, F.I.A. P.P.
E-mail : dr.alok.patra@gmail.com

Consultant :-

Pranabananda Seva Sadan
Psychiatric Nurshing Home

- EX- National Institute of Mental Health & Neuroscience, Bangalore
- Central Institute of Psychiatry, Ranchi
- Calcutta National Medical College & Hospital.
- Calcutta Pavlov Hospital (Gobra).
Antara, Baruipur

ভূমিকা

রাস্তাঘাটে পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ জনের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলে কেমন আছেন ? — অধিকাংশ জনই বলেন — না ভালো নেই । কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে শোনা যায় — তেমন কোনো সমস্যা নেই - তবু কেমন একটা টেনশান, উদ্বেগ, ভালো না লাগা ঘুম না হওয়া ইত্যাদি হয় । এর কারণ হচ্ছে বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষই অবসাদ, উদ্বেগ, অনিদ্রার শিকার । কাজের চাপ, পড়াশুনার চাপ, সংসারে ছোটোখাটো ঝামেলা বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ; সেই সঙ্গে ক্ষমতার থেকে বেশী কিছু চাওয়ার পিছনে ছোটা, ছুটেও না পাওয়ার জ্বালা, Competitive লাইফ, যান্ত্রিক জীবন এবং Stress বা মানসিক চাপ মোকাবিলার অক্ষমতা । তার সঙ্গে অসুখ বিসুখ তো আছেই । সাধারণ চিকিৎসকের কাছে যে সমস্ত রোগী যান - তার শতকরা ৫০% জনই ভোগেন মানসিক সমস্যায় — যে কথা রোগী নিজেও বোঝেন না — ডাক্তারাও বলেন না। ফলে হাজার হাজার টাকা খরচ করেও সুরাহা মেলে না । এই সমস্ত কারণে এই পুস্তিকায় আলোচনা করা হলো অবসাদ, উদ্বেগ, অনিদ্রা নিয়ে — যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই নিজের সমস্যাটা চিনে নিতে পারেন । সঙ্গে মানসিক চাপ ও অনিদ্রা সমস্যার সমাধানের কিছু সাধারণ পরামর্শ দেওয়া হলো যাতে পাঠকগণ চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই উপশম পেতে পারেন ।

অবসাদ, বিষন্নতা বা ডিপ্রেশান

অবসাদ, বিষন্নতা বা ডিপ্রেশান - কথা গুলো আমরা এখন হামেশাই ব্যবহার করি। কিন্তু ডিপ্রেসান রোগ হিসাবে চিহ্নিত হয় যখন কিছু নির্দিষ্ট Criteria পূরণ করে। এমনি দিনের কিছু সময়ের জন্য খারাপ লাগা কম বেশী সবারই হয়। তাছাড়া কোন কারণে Upset হলে, নিকট জনের কাছ থেকে মানসিক আঘাত পেলে পরীক্ষা বা চাকুরীতে ব্যর্থ হলে, স্বজন বিয়োগ হলে কিছু দিনের জন্য অবসাদ হওয়া স্বাভাবিক। ডিপ্রেসান মানসিক রোগ হিসাবে চিহ্নিত হয় যখন নিম্নবর্ণিত Criteria গুলো দু-সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বিরাজ করে।

১. ডিপ্রেসান (Depression) ঃ-

* বিষন্ন অবসাদ মন - সব সময় কেমন যেন খিঁচিয়ে থাকা ভাব, কোন কিছু ভালো না লাগা, মনে আনন্দ, ফুর্তি, হাঁসি খুশি ভাব না থাকা, চব্বিশ ঘন্টা শুধু বিষন্ন থাকা ইত্যাদি হয়।
* সব কিছুর প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়া, কারো সাথে কথা বলতে ভালো না লাগা, চুপচুপ একা একা বসে বা শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হওয়া।
* শরীরের শক্তি কমে যাওয়া, অল্প পরিশ্রম করলেই হাঁপিয়ে ওঠা, ক্লান্ত হয়ে পড়া।
* মনঃ সংযোগ কমে যাওয়া, ধৈর্য্য কমে যাওয়া, পড়াশুনা বা ব্রেনের অন্য কাজ করতে না পারা, ভুলে যাওয়া বা স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়া।
* আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া, নিজের উপর আস্থা কমে যাওয়া, নিজের অবমূল্যায়ন করা, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হওয়া, Inferiority feelings develop করা।
* অপরাধ বোধ জন্মানো, "পূর্বজন্মের কোনো অপরাধের জন্য বা পূর্বের কোন ভুলের জন্য বর্তমান সাজা মিলছে, ভগবানের অভিশাপের জন্য এ কষ্ট হচ্ছে" - এমন মনে হওয়া।
* ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশাবাদী হওয়া।

* Negative Cognition develop করা, "আমার কোনো যোগ্যতা বা মূল্য নেই (worthlessness)", "আমি একা হয়ে যাচ্ছি, আমাকে কেউ সাহায্য করার নেই (helplessness)", "আমি কখনও ভালো হবো না (hopelessness)" -এ রকম ভাবা ।
* "এ ভাবে বাঁচার থেকে মরা ভালো" - এরকম মনে হওয়া, আত্মহত্যার চিন্তা, পরিকল্পনা করা - গলায় দড়ি দিয়ে, বিষ খেয়ে, ঝাঁপ দিয়ে ম রবার চেষ্টা করা ইত্যাদি হয় ।
* ঘুম কমে যাওয়া । ঘুম আসাতে দেরী হওয়া বারবার ভেঙ্গে যাওয়া বা ভোরের দিকে ঘুম না হওয়া ।
* খিদে কমে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া ।
* সেক্স কমে যাওয়া - সঙ্গম বা হস্তমৈথুন করার ইচ্ছে না হওয়া । মাথার - শরীরের যন্ত্রনা হওয়া, পায়খানা পরিষ্কার না হওয়া; আরও নানান শারীরিক কষ্ট হওয়া ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ ।

২. ম্যানিয়া (Mania) ঃ-

* অবসাদের ঠিক উল্টোমেরুতে থাকে উল্লাস রোগ বা ম্যানিয়া। সাধারণত অবসাদ গভীর হলে, দীর্ঘায়িত হলে সেটা ম্যানিয়া আকারে প্রকাশ পায়।

ম্যানিয়ার লক্ষণ গুলি হলো নিম্নরূপ ঃ-

* মনে অস্বাভাবিক রকমের আনন্দ স্ফূর্তি থাকা, নাচবার গাইবার ইচ্ছে হওয়া, প্রচন্ড রকমের হাসি খুশিতে থাকা, বেশী মাত্রায় কৌতুক রসিকতা করা । অথবা অসম্ভব রেগে থাকা; সবসময় গালিগালাজ, মারামারি করা ইত্যাদি ।
* শরীরের শক্তি বেড়ে যাওয়া, দিনরাত পরিশ্রম করেও শরীরের ক্লান্তি না আসা ।
* নিজের অবস্থা সম্পর্কে খুব উচ্চধারনা পোষণ করা, প্রচন্ড রকমের আশাবাদী হওয়া ।

* অস্থির হওয়া, ঘরের মধ্যে পায়চারী করা, পাড়ায় বা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো।
* লোকজনের সাথে বেশী মেলামেশা করা, সবার সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব করা - এমনকি অচেনা লোকের সাথেও বন্ধুত্ব করা।
* অতিরিক্ত কথা বলা, কথা বলতে বলতে গলা ধরে যাওয়া।
* প্রচুর সাজগোজ করা, রঙ চঙে জামা কাপড় পরা, অকারণে জিনিসপত্র কেনা, বোকার মত ব্যবসায় প্রচুর টাকা খরচ করা।
* প্রচুর পয়সা খরচ করা, লোককে দান ধ্যান করা।
* ক্ষিদে খুব বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া।
* ঘুম কমে যাওয়া, ঘুমানোর প্রয়োজন বোধ না করা।
* সেক্স বেড়ে যাওয়া।
* বড় বড় কথা বলা - আমি প্রধান মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, অমিতাভ বচ্চন, আমার অনেক পয়সা, অনেক ক্ষমতা, আমি ভগবানের দূত, সবার সব সমস্যার সমাধান করতে পারি - এরকম ভাবা।

৩. **বাইপোলার অ্যাফেকটিভ ডিসঅর্ডার (Bipolar Affective Disorder) ঃ-**

এই রোগে চক্রাকারে ম্যানিয়া ও ডিপ্রেসান হতে থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে শুধু ম্যানিয়া বার বার হতে থাকে।

৪. **রেকারেন্ট ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার (Recurrent Depressive Disorder) ঃ-**

এই রোগে বার বার ডিপ্রেসান হতে থাকে। ডিপ্রেসান সাধারণতঃ ২ সপ্তাহ থেকে ৩ মাস বা ৬ মাস পর্যন্ত থাকে। তারপর চিকিৎসাতে বা স্বাভাবিক নিয়মে তা কেটে যায়। কারও কারও ক্ষেত্রে জীবনে এক বারই ডিপ্রেসান হয়। বাকীদের ক্ষেত্রে আবার ঘুরে ঘুরে হয়। ডিপ্রেসান ২-৩ বৎসর ছাড়াও হতে পারে, আবার প্রতি বৎসরও হতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে বৎসরের মধ্যেই ৩-৪ বার তার থেকে বেশি বার হয়।

৫. সিজোন্যাল অ্যাফেকটিভ ডিসঅর্ডার (Seassonal Affective Disorder) ঃ-

এই রোগ একটি বিশেষ ঋতুতে যেমন শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষায় বার বার ম্যানিয়া বা ডিপ্রেসান হতে থাকে। অনেকের ক্ষেত্রে ঋতু পরিবর্তনের সময় যেমন শীত থেকে গরম পড়ার সময়, গরম থেকে বর্ষা বা হেমন্ত থেকে শীত পড়ার সময় এই রোগ হতে দেখা যায়। ঋতু অনুযায়ী সূর্যের আলো কম বা বেশী হওয়ার প্রভাবে শরীরে মেলাটোনিন হরমোন কম বা বেশী হওয়ার কারণে ডিপ্রেসান বা ম্যানিয়া হতে দেখা যায়।

৬. ডিসথাইমিয়া (Dysthymia) ঃ-

দুবছরের বেশী সময় ধরে বিষন্নতা থাকে - যা খুব তীব্র নয় এবং যাতে দৈনন্দিন কাজকর্ম, সামাজিক মেলামেশা একেবারে বন্ধ হয় না তাকে ডিসথাইমিয়া বলে। সঙ্গে ঘুম, ক্ষিদে কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া, শরীরে এনার্জী কমে যাওয়া, অল্পেতে ক্লান্তি, নিজের উপর আস্থা কমে যাওয়া, মনোসংযোগের অভাব, সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, সর্বক্ষেত্রে হতাশা অনুভব করা ইত্যাদি হয়।

৭. হাইপোম্যানিয়া (Hypomania) ঃ-

ম্যানিয়ার লক্ষণ যখন কম তীব্র হয় - যাতে রোগীর দৈনন্দিন কাজকর্ম ও সামাজিক মেলামেশা বন্ধ হয় না তখন তাকে হাইপোম্যানিয়া বলে।

৮. সাইক্লোথাইমিয়া (Cyclothymia) ঃ-

২ বৎসরের বেশী সময় ধরে চক্রাকারে যদি অসংখ্য বার হাইপোম্যানিয়া ও ডিপ্রোসান হয় তবে তাকে সাইক্লোথাইমিয়া বলে।

৯. অ্যাটিপিক্যাল ডিপ্রেসান (Atypical Depression) ঃ-

এই রোগে রোগীর ডিপ্রেসান সাথে ঘুম কমে যাওয়ার পরিবর্তে ঘুম বেড়ে যায়, ক্ষিদে কমে যাওয়ার পরিবর্তে বেড়ে যায়, সেক্স কমে যাওয়ার পরিবর্তে বেড়ে যায়, ওজনও কমে যাওয়ার পরিবর্তে বেড়ে যায়। শরীর নিথর অবশ লাগে. রোগী বেশীর ভাগ সময় ঘুমোয়, ঘুম থেকে উঠে খায়,

সেক্স করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যের সামান্য সমালোচনায় স্পর্শকাতর হওয়া এবং ফলস্বরূপ অল্পেতে বিষন্ন হয়ে পড়া ইথ্যাদি হয়।

১০. **ক্রনিক ম্যানিয়া বা ডিপ্রেসান (Chronic Mania or Depression) ঃ-**

ম্যানিয়া বা ডিপ্রেসান ২ বৎসরের বেশী সময় ধরে থাকলে তাকে ক্রনিক ম্যানিয়া বা ডিপ্রেসান বলে।

১১. **রেকারেন্ট ব্রীফ ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার (Recurrent Brief Depressive Disorder) ঃ-**

সাধারণতঃ কিশোরদের মধ্যে এ রোগের প্রবনতা বেশী দেখা যায়। ৪ থেকে ১৪ দিনের জন্য ডিপ্রেসান হয় যখন রোগী বেশী ঝিমোতে বা ঘুমোতে থাকে, বেশী খায় এবং সেক্সুয়াল অ্যাকটিভিটি বেড়ে যায়। ২ - ৩ মাস ঠিক থাকার পর আবার এরকম হয়। বৎসরের এমনকি মাসের মধ্যেও রোগী ভালো হয় আবার অসুস্থ হয়।

উদ্বেগ বা অ্যাংজাইটি

কথায় কথায় আমরা বলি আমার সে বা ও সবসময় টেনশান, নার্ভাসনেশ বা অ্যাংজাইটিতে ভোগে। কিন্তু অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বহু প্রকার ভেদ আছে যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং চিকিৎসাও ভিন্ন।

১. **জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার (Generaliged Anxirty Disorder) ঃ-**

- ✳ সব সময়ে উদ্বেগ - খারাপ কিছু ঘটে যাবে, বিপদ হয়েছে - এরকম মনে হওয়া। মনঃসংযোগ করতে না পারা।
- ✳ সব সময় টেনসন ও নার্ভাসনেস থাকা - অস্থিরতা, মাথাব্যথা, হাত পা কাঁপা, relaxed না হতে পারা।
- ✳ মাথা খালি খালি লাগা, ঘাম হওয়া, শ্বাস বেড়ে যাওয়া, পেটে অস্বস্তি হওয়া, মাথা ঘোরা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া।
- ✳ সব সময় মনে হওয়া নিকট আত্মীয় কোন দুঘ৪টনায় পড়েছে বা অসুখ করেছে।

২. প্যানিক ডিসঅর্ডার (Panic Disorder) ঃ-

হঠাৎ করে তীব্র anxiety হওয়াকে Panic attack বলে। বুক ধড়পড় করা, ব্যথা করা, গলা থেকে আওয়াজ না বেরোনো, মাথা ঘোরা, হাত কাঁপা, ঘাম দেওয়া, বার বার প্রসাব পাওয়া, পেট ব্যথা করা, 'এক্ষুনি মারা যাবো বা পাগল হয়ে যাবো' - এরকম মনে হওয়া ইত্যাদি হয়। ১০ থেকে ১৫ মিনিট এরকম হয়, তারপর ঠিক হয়ে যায়, বারবার এই একই কষ্ট হতে থাকে, সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকা - এক্ষুনি আবার ওরকম হবে।

৩. ফোবিয়া (Phobia) ঃ-

কোনো কিছুর উপর অযৌক্তিক এবং অস্বাভাবিক রকমের ভয় হওয়া এবং তা সর্বাদা এড়িয়ে চলাকে ফোবিয়া বলে।

a) অ্যাগোরা ফোবিয়া (Agoraphobia) ঃ-

একা বাইরে যেতে ভয় পাওয়া। কাউকে সঙ্গে না নিয়ে বাড়ির বাইরে এক পাও না যেতে পারা যে জায়গা থেকে সহজে পালানো যায় না সে জায়গায় যেতে ভয় পাওয়া। যেমন দোকানে বা লোকজনের জটলায় যেতে ভয় পাওয়া. ট্রেনে, বাসে বা প্লেনে চড়তে ভয় পাওয়া। ওই সব জায়গায় গেলে প্রচন্ড রকমের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হওয়া - এ রোগের লক্ষণ। রোগী মনে সবসময় ভয় বা আতঙ্ক থাকে যে বাইরে বেরোলে তার মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, প্রেসার বেড়ে যাবে, হার্ট অ্যাটাক হবে অথবা অন্য একটা কোন মারাত্মক শারীরিক অসুখ হবে। কারো কারো ক্ষেত্রে বুক ধড়ফড় করা, ঘাম হওয়া - এক্ষনি মারা যাবো এরকম মনে হওয়া (যাকে বলে প্যানিক অ্যাটাক্) ইত্যাদি হয়। এইসব আতঙ্কের কারণে রোগী একা বাইরে বেরোয় না। কাজ ছেড়ে দেয়, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দেয়। ধীরে ধীরে গৃহবন্দী হয়ে যায়। সঙ্গে কেউ থাকলে বাইরে বেরোয় - এই ভাবনায় যে কিছু ঘটলে সঙ্গী ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ সঙ্গী নিয়েও বাইরে বেরোতে পারে না ঐ অমূলক ভয়ের কারণে।

b) সোসাল ফোবিয়া (Social Phobia) ঃ-

পাঁচজনের সামনে কিছু বলতে ভয় পাওয়া। বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে কথা বলতে ভয় পাওয়া, বাইরে খেতে বা প্রসাব করতে ভয় পাওয়া ইত্যাদি এই রোগের লক্ষন। এই ধরনের রোগীরা সবসময় পাঁচজনের সামনে একটা অস্বস্তি অনুভব করে। ভাবে বোধহয় সবাই তাকে লক্ষ্য করছে এবং তার মধ্যে জড়তা বা smartness - এর অভাবটা ধরা পড়ে যাচ্ছে। সেই কারণে social situation এড়িয়ে চলতে থাকে।

c) স্পেসিফিক ফোবিয়া (Specific Phobia) ঃ-

ছোট বিশেষ কোন বস্তুর, পরিবেশ, পরিস্থিতিকে ভয় পাওয়াকে স্পেসিফিক ফোবিয়া বলে।

❋ ন্যাচারাল, এনভায়ারমেন্টার টাইপ (Natural envioumental type) ঃ- জল, ঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ, উচ্চতাকে ভয় পাওয়া।

❋ ব্লাড, ইনজেকসান, ইনজুরি টাইপ (Blood, Injection, injury type) ঃ- রক্ত, কাটা ছেঁড়া, ক্ষতকে ভয় পাওয়া।

❋ সিচুয়েশন্যাল টাইপ (Situational type) ঃ- গাড়ী, ট্রেন, বাসে, প্লেনে চড়তে ভয় পাওয়া; পাহাড়ে, ব্রীজে উঠতে; সুড়ঙ্গে ঢুকতে ভয় পাওয়া ইত্যাদি।

❋ এ্যানিমেল ফোবিয়া (Animal Phobia) ঃ- জন্তু জানোয়ারকে ভয় পাওয়া - এ রোগের লক্ষন।

❋ ক্লসট্রো ফোবিয়া (Cloustro Phobia) ঃ-বদ্ধ জায়গায় ঢুকতে ভয় পাওয়া।

❋ এক্রো ফোবিয়া (Acro Phobia) ঃ- উঁচুতে উঠতে ভয় পাওয়া।

❋ জু ফোবিয়া (Zoo Phobia) ঃ- পোকা মাকড়ে ভয় পাওয়া।

❋ অ্যাস্ট্রা ফোবিয়া (Astra Phobia)ঃ- মেঘ ডাকা, বিদ্যুৎ চমকানোকে ভয় পাওয়া।

d) অন্যান্য ফোবিয়া (Others Phobia) ঃ- খেতে গেলে খাবার শ্বাস নালীতে ঢুকে যাবার ভয় পাওয়া, বমি হওয়ার ভয় পাওয়া, অন্যের থেকে ছোঁয়াচে অসুখ হয়ে যাবার ভয় পাওয়া ইত্যাদি।

e) এক্সামিনেশন ফোবিয়া (Examination Phobia) ঃ- কিছু ছাত্র পরীক্ষাকে প্রচন্ড রকমের ভয় পায়। পরীক্ষা এলেই এ্যাংজাইটি, টেনশান, নার্ভাসনেস আসে। বুক ধড়পড় করে, হাত পা কাঁপে, গলা শুকিয়ে যায়, আওয়াজ বসে যায়, ঘাম হয়, মাথা ঘোরে - ঝিম্ ঝিম্ করে। আত্মবিশ্বাস কমে যায়, পড়া ভুলে যায়। পড়ায় মনোসংযোগ করতে পারে না। সব সময় মনে হয় পাশ করতে পারব না। ঘুম হয় না, ক্ষিদে হয় না। সব মিলিয়ে সমস্যাটা এত প্রবল হয় যে তারা পরীক্ষায় বসতে পারে না। ফলস্বরূপ year loss হয়। পরীক্ষা চলে গেলেই সব ঠিক। আবার পরীক্ষা এলেই একই সমস্যা দেখা দেয়।

অন্যান্য নিউরোটিক ডিসঅর্ডার

1. এ্যাডজাস্ট মেন্ট ডিসঅর্ডার (Adjustment Disorder) ঃ- কোনো বড় রকমের স্ট্রেস এর ঠিকঠাক মোকাবিলা করতে না পারলে এই ধরণের সমস্যা হয়। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু, চাকরি ছাঁটাই, বড় শারীরিক অসুখ, মেয়েদের প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে যাওয়া, স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ, নতুন কোন জায়গায় বদলি হওয়া বা জীবনের অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাতে এই রোগের সৃষ্টি হতে পারে। রোগীর Anxious Depressed হওয়া, cope করতে না পারা, পরিকল্পনা করতে না পারা, রোজকার কাজকর্ম করতে না পারা, ঘুম ক্ষিদের অসুবিধা হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

2. অ্যাকিউট স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (Acute Stress Disorder) ঃ- বড় রকমের কোন মানসিক আঘাত - যেমন কোন দুর্ঘটনা, নিকটজনের মৃত্যু, বন্যা, ভূমিকম্প, খুন, ধর্ষণ, দাঙ্গা ইত্যাদির পর সর্বদা ভীত আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে পড়া এই রোগের লক্ষণ। স্মৃতি লোপ পাওয়া, হতভম্ব হওয়া, বোধশক্তি লোপ পাওয়া, গুম মেরে যাওয়া, নিজের পরিচয় ভুলে

যাওয়া বা চারপাশের পরিবেশ ভুলে যাওয়া ইত্যাদি হয়। বার বার দুর্ঘটনার কথা মনে হওয়া, অস্থির হওয়া, রেগে যাওয়া, ঘুম খিদে কমে যাওয়া, চমকে চমকে ওঠা, চ্যং চ্যং করা, মনোসংযোগ কমে যাওয়া, কাজকর্ম-মেলামেশা বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ । দুর্ঘটনার কথা, আলোচনা বা ঐ প্রসঙ্গ উঠলে অস্বাভাবিক হয়ে পড়া এবং এই সব এড়িয়ে চলা এই রোগের লক্ষণ ।

3. **পোষ্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (Post Traumatic Stress Disorder) ঃ-**

Acute Stress Disorder সাধারণত একমাস পর্যন্ত থাকে। এক মাসের পরও এই অসুবিধা থাকলে তাকে Post Traumatic Stress Disorder বলে।

4. **ডিপারসোনালাইজেশন-ডিরিয়ালাইজেশন ডিসঅর্ডার (Depersonalisation-Derealisation Disorder) ঃ-**

এই রোগে রোগীর মনে হতে থাকে যে সে যেন হঠাৎ বদলে গেছে, তার কোনো অনুভূতি নেই। সে একটা প্লাস্টিক বা যন্ত্রের মতো অথবা সে যেন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। একে বলে ডিপারসোনালাইজেশন। আবার কখনো রোগীর মনে হয় যেন চারপাশের সবকিছু বদলে গেছে। চেনা ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা সব যেন কেমন অচেনা নতুন নতুন লাগছে। একে বলে ডিরিয়ালাইজেশন।

5. **অ্যাবনর্মাল গ্রিফ (Abnormal Grief) ঃ-**

নিকট আত্মীয় বন্ধু পরিজনের মৃত্যুর পর কাঁদা, বিলাপ করা, বিষন্ন হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু কারো কারো তা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে, যেমন কেউ শোকার্ত হন না, কেউ বা উল্লসিত হন, কেউ মৃত্যুকে অস্বীকার করেন এবং মৃতকে জীবিত ধরে নিয়ে আগের মতো আচরণ করেন। কেউ বা দীর্ঘদিন বিষন্নতায় ভোগেন। খিদে খুব কম, ঘুম কম, কাজকর্ম বা অন্যের সাথে মেলামেশা করেন না। সর্বদা মৃতের স্মৃতি বা সামগ্রীর মধ্যে ডুবে থাকেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসা না করলে শোক কাটে না।

6. অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার
(Obsessive Compulsive Disorder) ঃ-

A) অবসেসন (Obsession) ঃ

একই চিন্তা বার বার মনে আসে বা যা নাকি অযৌক্তিক বা অবাস্তব রুগী তা মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করেও তাড়াতে পারে না। সর্বাদা মনো কষ্টে ভোগে। একে বলে obsession । বিভিন্ন রকমের Obsession গুলি হল ঃ-

* কন্টামিনেসান (Contamination) ঃ-
সর্বদা মনে হয় কোন নোংরা লেগে গেছে বা যাচ্ছে হাত পা বা শরীরে। তাই ছোঁয়াছুঁয়ি এড়িয়ে চলা বা বার বার ধোয়া ধুয়ি করা ।

* ডাউট (Doubt) ঃ-
সবসময়ে মনে খটকা ঠিক করলাম তো নাকি ভুল করলাম। যেমন - প্যান্টের চেন লাগিয়েছিতো । AIDS হয়ে যায় নি তো, Rabis (রেবিস) হয়ে যায়নি তো ইত্যাদি।

* ইমেজ (Image) ঃ-
মনের মধ্যে মড়ার, ভুতের ছবি বার বার ভেসে ওঠা কিংবা কোন দুর্ঘটনার ছবি বা নর্দমার দৃশ্য, যৌন ক্রিয়ার দৃশ্য ভেসে আসা।

* রুমিনেশান (Rumination) ঃ-
নিকট আত্মীয় বা ভগবানের সাথে যৌন ক্রিয়া করছি বা লোককে খুন করছি এমনি চিন্তা মনের মধ্যে পাক খেতে থাকে। কিংবা মানুষ কেন বাঁচে, জীবনের অর্থ কি, ইত্যাদি প্রশ্ন বার বার মনে আসে।

B) কম্পালশান (Compulsion) ঃ

অযৌক্তিক অপ্রয়োজনীয় কাজ বার বার করতে থাকা। বিভিন্ন কম্পালশানগুলির নিম্নরূপ ঃ

* ওয়াশিং (Washing) ঃ-
নিজের হাত পা জামাকাপড় বার বার ধুতে থাকা, ঘর - দোর

বার বার মোছা-মুছি করা। বার বার স্নান করা, ল্যাট্রিন বাথরুম ব্যবহারের পর দীর্ঘসময় ধোয় ধুয়ি কার । বাহিরে থেকে এলে বা বাহিরের লোক কেউ এলে সব ধোয়াধুয়ি করা, সারাদিন কেবল ধোয়া-মোছাতেই ব্যস্ত থাক।

❋ চেকিং (Chequing) ঃ-

তালা লাগানো হোল কিনা, সুইচ অফ হোল কিন, টাকা ঠিক গোনা হোল কিনা বার বার পরীক্ষা করা।

❋ সিমেট্রি এন্ড প্রিসিসান (Symetry & Precession) ঃ-

দীর্ঘ সময় ধরে কাপ, প্লেট, গোছানো সাজানো, দুদিকে সমানভাবে জিনিস পত্র ভাগ কোরে রাখা, জুতো, ব্রাশ বার বার নেওয়া আবার রাখা ইত্যাদি।

অনিদ্রা এবং নিদ্রাজনিত গোলমাল

বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পরিমাণ ঘুমের প্রয়োজন হয়, গড় পড়তা ৭-৮ ঘন্টা ঘুম প্রতিরাত্রে প্রয়োজন হয়। আবার কিছু লোক মাত্র ৩-৪ ঘন্টা ঘুমিয়েই ভালো কাজকর্ম করতে পারেন। যতই বয়স বাড়বে ততই স্বাভাবিকভাবে ঘুমের প্রয়োজন কম হতে থাকে। ৭০ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রতিরাত্রে গড় পড়তা ৬ ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট।

১. অনিদ্রা (ইনসোমিয়া Insomnia)ঃ-

ইনসোমিয়া মানে হল কম ঘুম হওয়া। ৫ জনের ১ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির যতটা ঘুমের প্রয়োজন হয় ততটা ঘুমোতে পারেন না। কম ঘুম হওয়ার কারণে ঃ-

- ঘুম থেকে সহজে উঠতে পারেন না।
- খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙ্গে যায়।
- বারবার ঘুম ভেঙ্গে যায় বা অনেক সময় পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়।
- রাতে ঘুম থেকে উঠে সজীব অনুভূতি হয় না।

ঘুম কম হলে সারা দিন ধরে ক্লান্তিবোধও হয়, মনোযোগের অভাব ঘটে। খিটখিটে মেজাজ -কোনও কাজ করতে ভালো না লাগা ইত্যাদি।

২. হাইপারসমনিয়া (Hypersomnia) ঃ-

প্রয়োজনের বেশী ঘুম হওয়া, দিনের বেলায় অতিরিক্ত ঘু হওয়া।

৩. সমনামবুলিজম (Somnambulism) ঃ-

ঘুমের মধ্যে উঠে চলাফেরা করা, ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়া।

৪. স্লিপ টেরর (Sleep Terror) ঃ-

হঠাৎ খুব মারাত্মক স্বপ্ন দেখে উঠে বসা। চিৎকার করা, ভয় পাওয়া, বুক ধড়পড় করা, জোরে শ্বাস নেওয়া, ঘাম হওয়া। এসময়ে জাগানোর চেষ্টা করলেও রোগীকে জাগানো যায় না, আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

৫. নাইটমেয়ার (Nightmare) ঃ-

দুঃস্বপ্ন দেখা, দেখে বার বার ঘুম ভেঙ্গে ওঠা। উঠে স্বপ্নকে নিখুঁত ভাবে মনে করা। উঁচু থেকে পড়ে যাচ্ছে, কেউ মারতে আসছে, কাটতে আসছে- এরকম স্বপ্ন দেখা।

৬. রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম (Restless Leg Syndrome) ঃ-

ঘুমাতে যাবার সময় বা ঘুমের মধ্যে পায়ের পেশীতে একটা যন্ত্রনা বা অস্বস্তি অনুভব করা যা নাকি বাধ্য করে পা নাড়াতে (পা পাড়াতে) পা মালিশ করলে বা একটু ঘোরাঘুরি করলে স্বস্তি হয়। ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ লাগে না।

৭. স্লিপ এ্যাপনিয়া (Sleep Apnea) ঃ-

ঘুমের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া কিছুক্ষণের জন্য, তারপরে

শরীরের মধ্যে অস্থিরতা হওয়া, জোরে জোরে শ্বাস নেওয়া, ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া-আবার ঘুমিয়ে পড়া। চক্রাকারে এরকম হতে থাকে।

A. ঘুম কম হওয়ার কারণ ঃ

কম ঘুম হওয়ার অসংখ্য কারণ আছে ঃ-

ক। **সাময়িক সমস্যা ঃ-**

মানবিক অবসাদ, কাজ বা পারিবারিক সমস্যা, জেট ল্যাগ, রুটিনের পরিবর্তন, নতুন বিছানা বা আশপাশের জায়গার পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে ঘুম কম হয়। এই সব ক্ষেত্রে কম ঘুম হওয়া সাধারণত কিছু দিন পরে আপনা থেকেই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে যায়।

খ। **অবসাদ ঃ-**

অনেক সময় অবসাদের কারণে ঘুম কম হয়। অবসাদ একটি সাধারণ ঘটনা এবং যথোচিত ওষুধের মাধ্যমে অবসাদের চিকিৎসা ঘুমের সমস্যার সমাধান হয়।

গ। **অন্যান্য অসুস্থতা ঃ-**

অসুস্থতার কারণে ব্যথা, দমবন্ধভাব, পায়ের খিঁচুনি, বদহজম, কাশি, চুলকানি, হঠাৎ গরমবোধ, চিত্তভ্রংশ এবং মানসিক সমস্যার কারণে ঘুমের বিশৃঙ্খলা হতে পারে।

ঘ। **উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণ করে ঃ-**

এগুলি ও ঘুমের প্রতিবন্ধক হতে পারে।

- অ্যালকোহল
- ক্যাফাইন জাতীয় উৎপাদক যেমন চা ও কফি
- নিকোটিন (ধূমপান, জর্দা, খৈনী, দক্তা, নস্যি,, গুড়াকু)।

ঙ। **বদচিন্তা ঃ-**

শুধুমাত্র ঘুম ঠিকমত না হওয়ার ভয় এবং পরের দিন ক্লান্ত হয়ে পড়ার দুশ্চিন্তায় অনেকের ঘুম কম হয় ।

B. ঘুমের উন্নতি ঘটানোর জন্য যা করণীয় ঃ-

ক) **শরীরকে চেনা ও বোঝা ঃ-**

এটা বোঝা দরকার প্রতিরাত্রে অল্প সময়ের জন্য জেগে থাকা একটি স্বাভাবিক ঘটনা, কাজেই সেটাকে বেশী গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো। তাছাড়া ঘুম কম হওয়ার জন্য ভয় পাওয়া অবস্থার আরও অবনতি ঘটায়।

খ) **শরীরের ঘুমোনো-জাগার ছন্দ পালন ঃ-**

শরীর ঘুমোনো - জাগার রুটিনে অভ্যস্ত হয়। যদি তাকে বিনস্ত করে তোলা যায় তাহলে ব্যক্তি অনেক বেশি ঘুমোতে পারেন।

- তাই যতই ক্লান্ত হোন না কেন কখনো দিনের বেলা ঘুমবেন না, যদি রাতে ঘুমের সমস্যা থাকে।
- বিছানায় তখনই শোবেন যখন রাতে আপনার ঘুম পাবে।
- বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবিয়ে দিন।
- প্রতিদিন একই সময়ে বিছানা ত্যাগ করুন, এমন কি রাত্রে ভালো ঘুম না হলেও। শুয়ে থাকার ইচ্ছে দমন করুন।

গ) **শোয়ার ঘর ঃ-**

শোয়ার ঘর মানেই হল শান্ত আরামদায়ক জায়গা।

- ঘরটি যেন বেশি গরম বা ঠান্ডা না হয় এবং আওয়াজ না হয়।
- যদি আপনার সঙ্গির নাক ডাকে তবে কান বন্ধ রাখা বা চোখ ঢেকে রাখার প্রয়োজন। যাতে নাক ডাকে ঘুম না ভেঙে যায়।

- শোয়ার ঘর যেন রঙের পর্দায় ঢাকা থাকে যাতে সকালের সূর্যের আলোয় ঘুম ভেঙে না যায়।

- শোয়ার ঘরে কখনও কাজ, খাওয়াদাওয়া করবেন না, টেলিভিশন দেখবেন না ।

- বিছানা পুরনো হলে বা আরামদায়ক না হলে তা পাল্টে ফেলুন।

ঘ) **মেজাজ এবং পরিবেশ ঃ-**

বিছানায় শুতে যাওয়ার আগে আরাম করুন। উদাহরণ স্বরূপ অল্প পায়চারী করে স্নান করা, কিছু বই পড়া, হালকা গান শোনা, কোন কিছু গরম পানীয় পান করা (কফি ছাড়া) ইত্যাদি বেশি রাত্রে শরীরকে শিথিল করতে সাহায্য করে ।

ঙ) **রিল্যাক্সেশন টেপস ঃ-**

রিল্যাক্সেশন টেপস অনেক সময় গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করতে শেখায় এবং কিবাবে রিলাক্স বা পেশী শিথীল করতে হয় তা শেখায়। এটি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ঝেড়ে ফেলতে হবে নইলে ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলবে।

চ) **উত্তেজনা এড়ানো ঃ-**

কখনও এমন কোনও খাদ্য, ওষুধ বা পানীয় খাবেন না যাতে ক্যাফিন বা অন্যান্য উত্তেজনা উদ্রেককারী দ্রব্য আছে যেমন চা, কফি খাবেন না শুতে যাওয়ার আগে। ধূমপান করবেন না, শুতে যাওয়ার আগে অ্যালকোহল খাবেন না।

ছ) **ব্যায়াম ঃ-**

বিছানায় যাওয়ার আগে কোনও বেশি পরিশ্রমের বা অত্যন্ত সক্রিয় কোনও ব্যায়াম করবেন না। বস্তুত হালকা হাত পা সঞ্চালন জাতীয় ব্যায়াম বিছানায় যাওয়ার আগে শরীর শিথিল করতে সাহায্য করে।

জ) খাদ্য ঃ-

শুতে যাওয়ার আগে বেশি খাবার খাওয়া উচিত নয়।

ঝ) মূলরোগের চিকিৎসা ঃ-

ডাক্তারের পরামর্শ নিন অসুস্থ, অবসাদ গ্রস্ত বা ওষুধের কারণে ঘুম না হলে । অবশ্যই পেশাদার চিকিৎসকের অনুমোদিত প্রেশক্রিপশন বা পরামর্শ মত ওষুধ গ্রহণ করুন।

মানসিক চাপ বা স্ট্রেস (Stress)

স্ট্রেস বা মানসিক চাপ শব্দটি মানুষ তখনই ব্যবহার করেন যখন তাঁদের জীবনের থেকে চাহিদাগুলো এমনই বড়ভাবে দেখা দেয় যে তার সঙ্গে যুজ তে পারা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এই যুজতে পারা বা মোকাবিলা করার ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন হয় এবং একজন যেটাতে মানসিক চাপ অনুভব করেন অন্যজন তাতে চাপ নাও অনুভব করতে পারেন । ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে আমরা অনেকেই মানসিক চাপে ভুগি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় দীর্ঘদিন ধরে ভোগা মানসিক চাপ আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এবং আমরা অনেকেই এগুলি নিয়ন্ত্রণ করার পথ খুঁজে বেড়াই।

A) স্ট্রেস বা মানসিক চাপ আসলে কি ?

মানসিক চাপ বর্ণনা করা বা মাপা মুশকিল । কিছু ব্যক্তি ব্যস্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্যস্ত থাকেন এবং জীবনের সঙ্কটকালের ঠান্ডা মাথায় সব কিছুর মোকাবিলা করতে পারেন । আবার অন্য ব্যক্তি দৈনন্দিন রুটিনের সামান্যতম পরিবর্তনে হয়ে পলেন উদ্বিগ্ন বা পীড়িত, হতাশাগ্রস্ত । অনেক লোক এই অবস্থার মধ্যে ভেঙ্গে পড়েন এবং স্ট্রেসের বা মানসিক চাপের শিকার হন।

মানসিক চাপ বৃদ্ধির লক্ষণগুলো হল ঃ-

- ঠিকমত ঘুম না হওয়া।
- সামান্য ঘটনায় ধৈর্য্যচ্যুতি এবং অস্বস্তিবোধ হওয়া।

- মনের মধ্যে যে কাজের চিন্তাভাবনা আছে তাতে মনোযোগ দিতে না পারা।
- কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছনো।
- মদ্যপান বা ধূমপান বেশি করা।
- খেতে ভালো না লাগা।
- আরাম করতে না পারা এবং সবসময় কিছু একটা কাজ করতে হবে এরকম অনুভূতি হওয়া।
- সবসময় উদ্বেগ, টেনশান, নার্ভাসনেস, অস্থিরতা অনুভূতি হওয়া।
- পেটের মধ্যে একটা গাঁট বা স্ফীতির অনুভূতি হওয়া বা মুখ শুকনো হয়ে ঘাম ঝরা বা বুক দূর দূর করা ইত্যাদি হয়।
- অনাকাঙ্খিত চিন্তাভাবনায় ভীড়ে জর্জরিত হওয়া, কঠিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে স্লথ গতি হওয়া ইত্যাদি হয়।

B) মানসিক চাপ কতটা ক্ষতিকারক ?

ক্রমাগত চলতে থাকা মানসিক চাপ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উদাহরণ স্বরূপ মানসিক চাপ হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর - হার্টের উপর প্রেসার পড়ায় হার্টের সমস্যা দেখা দেয় পরবর্তী জীবনে। মানসিক চাপ নানান শারীরিক অসুস্থতার জন্য দায়ী হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি স্ট্রেস বা মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায় তাহলে অনেকক্ষেত্রে হাইপারটেনশন, করোনারী হার্ট ডিজিজ, ইরিটেবল বাওল সিনড্রোম, এ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডার, এস্থমা, আরথ্রালজিয়া, ফাইব্রোমায়ালজিয়া এনোরেক্সিয়া নার্ভোসা, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, প্রিমেনষ্ট্রুয়াল টেনসান, মেনোপজাল সিনড্রোম, মাইগ্রেন, টেনশন হেডেক, সেক্সুয়াল ডিসঅর্ডার ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। সঙ্গে কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হওয়া ইত্যাদি হয়।

C) **কিভাবে মানসিক চাপ এড়াবেন ?**

এখানে কতকগুলো পরামর্শ দেওয়া হল যা মানসিক চাপ কমাতে এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে ।

ক) **মানসিক চাপের তালিকা গঠন ঃ-**

আপনি একটা মানসিক চাপের তালিকা তৈরী করতে পারেন । কয়েক সপ্তাহের জন্য একটা ডাইরি রাখুন এবং আপনার মানসিক চাপের স্তর যখন তীব্র হচ্ছে তার সময়, স্থান, ঘটনা এবং সেই সব ব্যক্তির তালিকা তৈরী করুন । এতে একটা প্যার্টান দৃষ্টিগোচর হবে । এটা হতে পারে রাস্তা ঘাটের ঝন্‌ঝাট যা আপনার কাজে যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে আপনার দিনের শুরুটা খারাপ করে দেয়, অথবা এটা হল আপনার রোজকার একঘেয়ে রান্নার কাজ, প্রতিবেশীর চিৎকার করা কুকুর বা আপনার সহকর্মীর দূরব্যবহার । অথবা অন্য কিছু ধরনের ঘটনা যা আপনার মানসিক চাপের সৃষ্টি করে ।

একবার যদি আপনি আপনার রোজকার মানসিক চাপের কারণ চিনতে পারেন, তাহলে দুটি জিনিস তখন আপনাকে সাহায্য করতে পারে ।

এক ঃ আপনি এই কারণগুলো আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করুন, তাঁরা আপনাকে সাহায্য করতে পারেন এবং আপনিও কারণগুলোর বিষয়ে সচেতন হতে পারবেন যে ঠিক কোন কারণে আপনার মানসিক চাপ দেখা দেয় । এমন কী আসপাশের মানুষের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তার মাধ্যমেও সাহায্য পেতে পারেন ।

দুই ঃ এই পরিস্থিতিগুলোকে আপনি রিল্যাক্স বা মানসিক চিন্তার আরাম করার সময় হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন । আপনি সহজ মানসিক চাপ দূরীকরণের প্রক্রিয়া (নীচে দেখুন) ব্যবহার করতে পারেন যখন কোন মানসিক চাপের ঘটনা দেখা দেয় বা দেওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । সেই সময় যেমন যখন আপনার মনে চিন্তার জট পাকিয়ে যাবে তখন উদ্বেগ বা মানসিক চাপে জর্জরিত হওয়ার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ঘাড়ের ব্যায়াম করার চেষ্টা করতে পারেন ।

খ) সহজ মানসিক চাপ দূরীকরণ প্রক্রিয়া ঃ-

***দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ঃ-** এর মানে দীর্ঘ, গভীর ও ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ এবং আবার ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ । যদি আপনি কিছু সময় এগুলো করেন এবং সম্পূর্ণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ওপর মনোযোগ দেন তাহলে আপনি অনুভব করবেন যে এগুলি সত্যিই মানসিক চিন্তা দূর করছে ।

*** পেশীর প্রসারণ ও প্রত্যাবর্তন ঃ-** আপনার ঘাড় ঘোরানোর চেষ্টা করুন উভয় দিকে যতটা সম্ভ ব এবং তারপর রিলাক্স করুন । আপনার কাঁধ এবং পিঠের পেশী প্রসারিত করুন কয়েক সেকেন্ড এবং তারপরে পুরোপুরি রিলাক্স করুন ।

প্রথমে এই পদ্ধ তিগুলো অভ্যাস করুন যখন আপনি আরাম করছেন এবং তারপরে এগুলো রুটিনমাফিক করতে থাকুন যখন আপনি কোন মানসিক চাপে রয়েছেন ।

গ) সদর্থক মানসিক চাপ দূরীকরণ প্রক্রিয়া ঃ-

আপনার রোজকার রুটিনে সদর্থক মানসিক চাপ দূরীকরণের প্রক্রিয়াটি অভ্যাস করার সময় নির্দিষ্ট করুন । এই মানসিক চাপ দূরীকরণের প্রক্রিয়াটি না করার জন্য আপনার কাজ বা পরিবারের সমস্যাকে অজুহাত হিসেবে তৈরী করবেন না । পরিকল্পনা করুন এবং তা নিয়ে এগিয়ে চলার চিন্তাভাবনা করুন । বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ধরণের জিনিস পছন্দ করেন - বেশি সময় ধরে স্নান করা, ধীরে ধীরে ভ্রমণ, নিরিবিলিতে বসে থাকা বা গান শোনা ইত্যাদি । এই বিষয়গুলো মোটেই সময় নষ্ট নয় এবং এর জন্য আপনার যেন অপরাধ বোধ না থাকে । এগুলো হয়তো আপনার মানসিক চাপ দূরীকরণের এবং সহজ জীবনযাত্রার ফিরে যাওয়ার সময়ের উপযোগী হতে পারে ।

অনেক লোক আবার মেডিটেশন বা ধ্যান করা বা পেশীর ব্যায়াম কে মানসিক চাপ দূরীকরণের জন্য উপযোগী বলে মনে করেন । আপনি মানসিক চাপ দূরীকরণের টেপ ও (যা বাজারে পাওয়া যায়) কিনতে পারেন - যা আপনাকে এই গুলোর হাত থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করবে ।

ঘ) সময় বেরকরা ঃ-

দিনের মধ্যে কিছু সময় বের করুন কাজ মুক্ত থাকার জন্য এবং কিছু সময় বাইরে কাটানোর জন্য । উদাহরণ স্বরূপ, আপনার রোজকার সময়ের তুলনায় ১৫ থেকে ২০ মি আগে তৈরী হয়ে বের হওয়া একটা ভালো শুভারাম্ভ । আপনি এই সময়টা ভাবতে পারেন - সারাদিনের পরিকল্পনা করতে পারেন এবং দিনের কাজকর্মের প্রস্তুতি করতে পারেন তাড়াহুড়ো না করেই । সঠিক সময়ে নিয়মিত এবং যথার্থ ভাবে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য কাজের গন্ডীর বাইরে সময় বের করুন । খাওয়ার সময় কোন কাজ করবেন না । অত্যধিক কাজের চাপ থাকলে মানসিক চাপ কমাতে কাজের ফাঁকে ৫ থেকে ১০ মিনিট বিশ্রাম নিন ।

সপ্তাহে একবার বা দুবার কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ একা রাখুন এবং মনে মনে "দুঃশ্চি ্যা নয়" বলতে থাকুন । ঐ সময় ধীরে, ধীরে, কাজ করুন বা কোন পার্কে বসে থাকুন যা আপনাকে জীবনের ঝঞ্ঝাট ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে ।

ব্যায়াম

নিয়মিত ব্যায়াম আপনার মানসিক চাপ দূর করবে (এচাড়া এটি আপনাকে ফিট রাখবে এবং হার্টের রোগের সম্ভ াবনা কম করবে) । কমপক্ষে সপ্তাহের পাঁচদিন ৩০ মিনিট ব্যায়াম করুন । যদি আপনি নিয়মিত ব্যায়াম না করেন তাহলে দিনের শুরুতে জোরে হাঁটা দিয়ে আরম্ভ করুন । যদি আপনার ঘুমের অসুবিধা হয় তাহলে নিয়মিত ব্যায়াম তারও উন্নতি ঘটাতে পারবে ।

ঙ) ধূমপান এবং মদ্যপান ঃ-

ধূমপান বা মদ্যপান মানসিক চাপ দূর করে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা । উল্টে এগুলো মানসিক চাপ বাড়ায় । তাই যথাসম্ভ ব এগুলো কমাতে চেষ্টা করুন ।

চ) হবিসমূহ ঃ-

মানসিক চাপ এড়াতে অভিজ্ঞতা থেকে এমন 'হবি' পছন্দ করুন যার কোন সময়সীমা নেই, চাপ নেই যা সহজেই করা এবং বন্ধ করা যায়, উদাহরণ স্বরূপ ঃ খেলাধূলা, বোনা, গান শোনা, মৃৎশিল্পি, পাজল্স বা বইপড়া ইত্যাদি ।

ছ) চিকিৎসা ঃ-

এই সবকিছুর পরেও জীবনের কিছু সময়ে অত্যাধিক মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের মোকাবিলা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে । যদি মানসিক চাপ বা উদ্বেগ মারাত্মক হয় তাহলে ডাক্তার দেখান । ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন । মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা ঔষধের সাহায্যে বা বিভিন্ন সাইকোলাইক্যাল ও সাইকো স্যোসাল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে Coping Skill বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করেন ।

উপসংহার

উদ্বেগ, অবসাদ, অনিদ্রা বা মানসিক চাপের ভুক্তভুগী হলে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করা উচিত তা কাটিয়ে ওঠার । যদি দেখা যায় যে সেটা থেকে মুক্ত হওয়া যাচ্ছে না - কষ্ট হচ্ছে, পড়া, কাজ বা সাংসারিক জীবনের ক্ষতি হচ্ছে, তবে অবশ্যই মনোচিকিৎসকের কাছে যাওয়া দরকার । মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা (ফার্মাকোথেরাপী) ছাড়াও অন্যান্য সাইকোলোজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট যেমন সাপোটিভ থেরাপী, বিহেভিয়ার থেরাপী, কগনিটিভ থেরাপী, সাইকোথেরাপী, ক্রাইসিস ইন্টারভেনসন, কাউন্সেলিং, ম্যারাইট্যাল থেরাপী, ফ্যামিলীথ্যারাপী ইত্যাদি উপায়ে চিকিৎসা করেন এবং ব্যাক্তি সম্পূর্ণ নিরাময় লাভ করেন ।